‘চ্যানেলের রাজা’ ব্রজেন দাস ঃ জল-জয়ী মহাজীবন

আলোকপাত বিশেষ, সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দূরপাল্লার সাঁতারুদের চোখে স্বপ্ন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা। দেশের গৌরব মিহির সেন, আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল জয় করে বিখ্যাত। চ্যানেলের রাজা ব্রজেন দাস ছ'বার অতিক্রম করেছেন সেই চ্যানেল। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তার সাক্ষী হয়ে আছে। ওপার বাংলার সেই জল-জয়ী মহাজীবনের ওপর বিশেষ আলোকপাত। ঢাকা থেকে ফিরে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন লিখেছেন দিব্যেন্দু গুহ।

ব্রজেন দাস দাঁড়িয়েছিল কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে। দূর থেকে আমাদের দেখেই হাত নেড়ে স্বাগত জানাল। কাস্টমসের বেড়া পেরিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই স্মিত হেসে এগিয়ে এসে হাত ধরে বলল-আয়। আছস কেমন ? আসেন বৌদি।

দীর্ঘদিন পর বাল্যবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললাম ঃ তুই এখন কেমন আছিস বল ?

হেসে ব্রজেন বলল ঃ বাইচা আছি। ঢাকায় আসলি কদ্দিন পর ক' দেখি ?

কত হবে ? আটচল্লিশ বছর।

বাপরে। কয়েক যুগ পর। সেই ঢাকা আর নেই। অনেক বদলে গ্যাছে। চল, রিকসা ধরতে হইব।

তোর গাড়ি আনিসনি ?

গাড়ি গ্যারাজে। তাছাড়া রিকসায় তাড়াতাড়ি যাবি। চল, দেখলেই বুঝবি।

একটা আটো রিকসায় বসার জায়গা ছিল মাত্র দুজনের। বিরাট বুকের পাটা নিয়ে ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে বিশ্বে রেকর্ড স্থাপন করার পর আজ যার নাম ‘গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে উঠে গেছে সেই বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু আমাদের দুজনকে জোর করে পেছনে বসিয়ে আটো রিকসা চালকের পাশে নিজের জায়গা করে নিয়ে চালককে বলল ঃ ‘চলরে-বাঙলা বাজার চল।’

এখন বাঙলা বাজারের পাশে ফরাসগঞ্জেই আছে ‘লাড্ডু’, অর্থাৎ ব্রজেন দাস। আমরা পাড়ার বন্ধুরা স্বভাবতই ওকে ওর নাম ধরেই ডাকতাম। ছুটির দিনে ফরাসগঞ্জের বাড়ি থেকেই ওকে ডেকে নিয়ে সবাই মিলে দল বেঁধে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম বুড়িগঙ্গায়।

অটো রিকসা ধরে কিছুটা এগোতেই দেখা গেল সেই পল্টনের সুবিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের অনেকটাই নিশ্চিহ্ন। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে বাঙলা দেশের অভিজাত এলাকাগুলো, বেশ রুচিসম্মত পরিকল্পনা অনুযায়ীই বিস্তার ঘটেছে ঢাকা শহরের .....

নবাবপুরে এসে পড়তেই পরিচিত পুরোনো শহর বহু স্মৃতি জাগিয়ে উদ্ভাসিত হল। এবারে চেনা চেনা মনে হল ঢাকা শহরকে। তবে মনে হল, বড় বেশি ঘিঞ্জি, বড় বেশি ঠাসাঠাসি। রিকসায়, আটোতে শহরের সব পথ এমনভাবে ভরা যে গাড়ি চালানোই মুশকিল। মনে হচ্ছিল ঢাকার শহর যেন প্রধানত এক রিকসার শহরেই পরিণত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ রিকসা চলেছে সমস্ত রাস্তা জুড়ে। রিকসার ভীড় সরিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বেশ শক্ত। মুখ ঘুরিয়ে ব্রজেন বলল ঃ কিরে, অবস্থাটা দেখছস তো। এর জন্যেই কইছিলাম অটো রিকসায় তাড়াতাড়ি যাবি। তা কেমন বৌদি, আপনার কর্তার বাল্যলীলার ঢাকার শহর কেমন দেখ্‌তাছেন ?

আমার স্ত্রী হেসে বললেন ঃ আপনার বন্ধুর শুধু বাল্যলীলারই শহর, আপনারাতো প্রায় সারা জীবনটাই এখানে কাটল।

ব্রজেন বলল ঃ হ্যাঁ তা কইতে পারেন। তবে কলকাতায়ও ছিলাম কয় বছর, এখনও যাই।

আমি বলি ঃ সেতো বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার কয়েকটা বছর মাত্র, যে কয়বছর সেন্ট্রাল সুইমিঙে সাঁতরিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলি। বাকি জীবনটা বলতে গেলে তোর ঢাকাতেই কাটল। তোর ছোটবেলার অনেক কীর্তির কথাই গর্ব করে বলেছি অনেককে।

বন্ধুর প্রশংসায় ব্রজেন মুচকি হাসে। ওকে দেখতে দেখতে আমার বাল্যকালের সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। .....

শ্রাবণের ভরা বর্ষায় ছুটির দিনে আমরা দল বেঁধে বুড়িগঙ্গায় সাঁতার কাটতে এসেছি। পুরোভাগে সব সময়েই থাকত ব্রজেন। আমরা পাঁচ ছয় জন বুড়িগঙ্গায় উথাল-পাথাল ঢেউ দেখে হয়ত আধঘণ্টা বা বড়জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই উঠে গেছি। কিন্তু ব্রজেন সেই ভরা নদীতেই সাঁতরে ততক্ষণে নদীর ওপারে যাবার জন্যে মাঝনদীতে পৌঁছে গেছে। আমরা ওর কাণ্ড দেখে চিৎকার করে বলছি, 'লাড্ডু, ফিরা আয়। আইজ ওপারে যাইস না, নদীর অবস্থা আজ ভালো না। লা-ড্ডু, ফিরা আয়।–' কিন্তু লাড্ডু মানে ব্রজেন দাস ফিরে আসেনি। সেই বারো বছরেই ভরা বুড়িগঙ্গার উত্তাল জলরাশি কাটতে কাটতে চলে গেছে নদীর ওপারে। সদরঘাটের বাঁধানো রাস্তায় তখন ভীড় জমে গেছে কিশোর ব্রজেন দাসের সেই দুঃসাহসিক সাঁতার দেখবার জন্যে। এই বুড়িগঙ্গাই গড়েছে পরবর্তীকালের বিশ্ব-বিখ্যাত সাঁতারু ব্রজেন দাসকে। এই নদীই ছিল ওঁর সন্তরণ জীবনের লীলাভূমি। দশ-বারো মিনিটের স্নানে ওর মন ভরত না। সে নদীতে আসত ঘণ্টাধরে মনের আনন্দে সাঁতার কাটার জন্যে। নদী পারাপার ছিল ওর নিত্যকার অভ্যাস। আমরা কেউ কেউ ওঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হয়ত কোন কোন দিন ওঁর সঙ্গে সাঁতরে নদীর ওপারে চলে গিয়েছি। তবে ফিরে এসেছি খেয়া নৌকোয় – কিছুটা দূর হেঁটে গিয়ে। ব্রজেন ওপারে গিয়ে দু-চার মিনিট ডাঙায় দাঁড়িয়ে আবার সাঁতার কেটেই ফিরে এসেছে। কখনও কখনও মাঝনদীতে এসে প্রবল স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে দম বাড়িয়েছে, আবার কখনও চলন্ত এক লঞ্চে সাঁতরে উঠে তার মাস্তুল থেকেই এক ড্রাইভ দিয়ে চমকে দিয়েছে তীরে দাঁড়ানো দর্শকদের। ওঁর এই দুঃসাহসিক জলক্রীড়া অনেকেই দেখেছে, তবে বুঝতে পেরেছিল ক'জন যে এই দামাল ছেলের মধ্যেই সন্তরণে দিগ্বিজয়ী হবার অযুত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে ? হ্যাঁ, সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ। সে-ও এক অসাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে। চোখার সামনে ভেসে উঠল সেই ঘটনাটা।...

অবিভক্ত বাঙলার বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর স্ত্রী ইলা ঘোষকে নিয়ে যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৪ সালে ঢাকায় এসেছিলেন এক সাঁতারের প্রদর্শনীতে অংশ নিতে। ব্রজেন দাসের বাড়ির সামনেই পানা-ভরা এক বিশাল পুকুর প্রদর্শনী সাঁতারের জন্যে রাতারাতি পরিষ্কার করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন প্রফুল্ল ঘোষ ঢাকার সাঁতারুদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ব্রজেনকে নিয়ে আমরা সেই প্রতিযোগিতা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন ওর বয়স বড়জোর তের। বড় বড় সাঁতারুরা প্রতিযোগিতার জন্যে জলে নামতেই আমাদের পিড়াপিড়িতে শেষ পর্যন্ত জামাটা খুলে আমাদের কাছে রেখে হাফ প্যান্ট পরেই ব্রজেনও একেবারে বাঁদিকে নেমে গিয়েছিল। সাত-আটজন বয়স্ক প্রতিযোগীর সঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষও একেবারে ডানদিকে নেমে যান। সাঁতার শুরু হতেই দেখা যায় বাঁদিকে ব্রজেন দাস আর ডানদিকে প্রফুল্ল ঘোষ তীব্র বেগে এগিয়ে যাচ্ছেন বাকি প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে। প্রফুল্ল ঘোষ অবশ্য প্রতিযোগিতায় ছিলেন না, বাকিদের উৎসাহিত করার জন্যে খেলাচ্ছলেই জলে নেমে গিয়েছিলেন। পুকুরের শেষ মাথায় গিয়ে ফিরে আসার সময়েও দেখা গেল ব্রজেন দাস আর প্রফুল্ল ঘোষই সবার আগে। হয়ত বা ব্রজেন প্রফুল্ল ঘোষেরও একটু আগে পৌঁছে গিয়েছিল।

পরের দিনই বিজয়ী ব্রজেন কাপ হাতে নিয়ে প্রতিবেদকের বাড়ি 'সোনার বাঙলা' পত্রিকার মাঠে চলে এসেছিল ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। ছবি তোলার আগে অঙ্গে তুলে নিয়েছিল সদ্যকেনা এক সুইমিং কস্টুম। সম্ভবত সেই ঘটনার পরেই ব্রজেন আবিষ্কার করেছিল নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে। প্রফুল্ল ঘোষ সেই প্রতিযোগিতার পরেই কিশোর ব্রজেনকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কলকাতায় গিয়ে বিধিবদ্ধভাবে ট্রেনিং নিতে। ব্রজেন গিয়েছিল, ম্যাট্রিক পাশ করে।

এসব ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে গেলাম ফরাসগঞ্জে-ব্রজেনের বাড়িতে। ৬২।১ ফরাসগঞ্জ রোডের যে বাড়িতে আগে ব্রজেনরা থাকত তার ঠিক উল্টোদিকেই, দেখলাম ওঁর নতুন বাড়ি হয়েছে। তারই একতলায় থাকে ব্রজেন সপরিবারে। তবে ওঁর স্ত্রী আর মেয়ে তখন কলকাতায়। কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককলে ওঁকে বলেছিলাম ঃ মূলত স্মৃতিমন্থন আর তোর সঙ্গে দেখা হবে বলেই ঢাকায় যাচ্ছি, দিন কয়েকের জন্যে। সম্প্রতি তুই বড়গোছের অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছিস, তাই তোকে বিরক্ত না করে কাছাকাছি কোন হোটেলে উঠে পরে তোর সঙ্গে দেখা করব।

শুনেই ক্ষেপে গিয়ে ব্রজেন বলেছিল ঃ আগে তুই ঢাকায় আয়তো। তারপর দেখা যাবে কোথায় থাকবি।

যথাসময়ে নিজেই বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে পাকড়াওকরে তুলে নিয়েছিল অটোরিকসায়। বাড়িতে দুটো ঝি, একজন কাজের লোক। বেশ আদর যত্ন করল ওরা। স্নানটান সেরে ড্রইংরুমে বসে চা খেতে খেতে খুঁটিয়ে দেখলাম আরেকবার ব্রজেনকে। সম্প্রতি বাইপাস সার্জারির মত আরেক বিরাট চ্যানেল পেরিয়ে এলেও বেশ চনমনে, সজীব দেখাচ্ছে ওঁকে সেই ছোট বেলার

মতই। ষাটের ওপরে পৌঁছে গেলেও বয়সের ছাপ পড়েনি মোটেই। আমাকে নিয়ে তোলা ওঁর সাঁতারু জীবনের সেই প্রথম ছবিটা দেশবিভাগের ডামাডোল কোথায় হারিয়ে গেছে। ব্রজেনের অ্যালবামেও সেই ছবিটা খুঁজে পেলাম না। তের বছর বয়সে ওঁর সেই প্রথম কীর্তির ছবিটা আপনাদের খুব দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল।

দেখলাম, চিরকালের সুশৃঙ্খল ব্রজেনের অস্ত্রোপচারের পর বেশ রুটিনবাঁধা জীবন। সকাল দশটা নাগাদ ব্রেক ফাস্ট সেরে নিজের কিছু কাজে বেরয়। দুপুরে ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে বিশ্রাম। বিকেলে আবার গাড়ি নিয়ে যায় কাছাকাছি এক পার্কে। কিছুক্ষণ হাঁটে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে মুড়ি চা খেতে খেতে টিভির অনুষ্ঠান দেখে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত ওঁর ভাল লাগে। ওঁর স্ত্রী ছন্দাও একজন ভাল গায়িকা। রাত দশটা নাগাদ হাল্কা কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ে।

ব্রজেনের বাড়ির পাশেই বুড়িগঙ্গার তীর জুড়ে বোম্বের মেরিন ড্রাইভের মত শান বাঁধানো সড়ক এক সময়ে ছিল দেখার মত। শহরের দূর দূরান্ত থেকে মানুষেরা নদীর ধারের সেই সড়কে বেড়াতে আসতেন। রাতে ব্রজেনকে বললাম ঃ কাল ভোরে উঠে চল সদরঘাটের রাস্তায় বেড়িয়ে আসি। তারপর সড়কের পাশের কর্নেশনপার্কে বসে গল্প করা যাবে, যেমন করতাম ছোটবেলায়।

ব্রজেন কোন উৎসাহ না দেখিয়ে বলল ঃ কাল সকালে একটা রিকসা ঠিক করে দিচ্ছি, তোর বাল্যকালের স্মৃতিভরা জায়গাগুলি বৌদিরে দেখাইয়া আন। সদরঘাটের সেই রাস্তায় আর দেখার কিছু নেই।

কথাটা শুনে কেমন খটকা লাগল। মেরিন ড্রাইভের মত নদীর ধারের যে সড়ক নিয়ে আমরা গর্ব করতাম সেই রাস্তায় আর দেখার কিছু নেই মানে ?

পরের দিন খুব ভোরে উঠে একাই চলে গেলাম নদীর ধারের সেই সড়কে হাঁটতে। কিন্তু শ্যামবাজার থেকে নবাবী বাড়ি পর্যন্ত সেই পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত সড়ক কোথায় ? সড়কের দুপাশে গড়ে উঠেছে কৃষিপণ্যের অজস্র দোকান। শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত সেই কর্নেশনপার্কটাই উধাও। সদরঘাটের সড়কে দাঁড়িয়ে এখন আর কল্লোলিনী বুড়িগঙ্গার জল-শোভা দেখা যায় না। নদীর জল যাতে সড়কে উঠে পণ্য নষ্ট না করতে পারে এর জন্য সড়ক-জুড়ে দেওয়াল তুলে বুড়িগঙ্গাকে আড়াল করে ফেলা হয়েছে।

ব্রজেনের নিরুৎসাহের কারণ বোঝা গেল। বুড়িগঙ্গা নদীর ধারের সেই স্নিগ্ধ শোভার অনেকটাই এখন অবলুপ্ত। পরিবর্তিত সময়ের নতুনতর প্রয়োজনেই বদলে গেছে অনেক কিছু। ব্রজেনের ঠিক করে দেওয়া রিকসায় চেপে নবজাগ্রত বাঙলাদেশের নতুনতর সাধনার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা শহরের নতুন শ্রীকেও দেখা গেল। বেশ ভাল লাগল অনেক স্মৃতি মন্থন করে।

তবে আমার ঢাকায় আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অন্তরঙ্গ যে বন্ধুটি আজ বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু তার নিজের স্মৃতিচারণ থেকেই ওর কীর্তির স্মরণীয় মুহূর্তগুলো শুনে নেওয়া। সন্ধ্যাবেলায় ড্রইং রুমে বসেই ব্রজেনের সঙ্গে কথা হয়েছে। দেখেছি তিনটি বড় বড় অ্যালবামে সাজানো ওঁর সন্তরণ জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তের অজস্র ছবি। চা-মুড়ি খেতে খেতে সে সব স্মৃতিমন্থনে ওঁর আনন্দও ছিল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার কিছু আগেই যে মাসে ব্রজেন কলকাতায় পড়তে এলে ওঁর গুরু প্রফুল্ল ঘোষ পরমাগ্রহে ওঁকে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ক্লাবের বড় বড় সাঁতারুর সঙ্গে। পরিচয়-পালা শেষ হতেই ব্রজেনকে বলেছিলেন – এবার ব্রজেন বাঙাল একটু সাঁতার কেটে দেখাবে। আয় ব্রজেন জলে নামবি আয়।

ব্রজেন বলেছিল ঃ সাঁতারের পোশাক তো নাই। তাছাড়া জলে নামি নাই অনেকদিন। প্রফুল্ল ঘোষ ক্লাব থেকেই একটা কস্টুম জোগাড় করে ওকে বলেছিলেন, ‘নে এটা পরেই নেমে যা। তোর সাঁতার সবাইকে দেখাব।’

অগত্যা জলে নামতে হয়েছিল ব্রজেনকে। প্রফুল্ল ঘোষের নির্দেশে ক্লাবের সেদিনের ৫০ মিটারের সেরা সাঁতারুও ব্রজেনের সঙ্গে সাঁতার কাটতে জলে নেমেছিলেন। সেই দিনটির স্মৃতি মন্থনে ব্রজেন বলেন ঃ বুঝতে পেরেছিলাম দাদা আমার এক পরীক্ষাই নিচ্ছেন। আমার চরিত্রতো তুই জানিস। যে কোন পরীক্ষায় মন-প্রাণ নিমেষে তৈরি। পুলের রেলিঙের ধারে তখন সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সাঁতার দেখবার জন্যে। নিজের স্টাইলে সাঁতরে ছিলাম। ওদের ভাল সাঁতারু সেদিন আমার সঙ্গে পারেন নাই। সবাই খুব তারিফ করছিলেন। ওদের বিশ্বাস জন্মেছিল আমি ক্লাবে এলে ক্লাবের নাম হবে।

হ্যাঁ, সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের নাম উজ্জ্বল করেছিল ব্রজেন দাস।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ব্রজেন ছিল প্রথম নয়ত দ্বিতীয়। তৃতীয় স্থান পেয়েছে কদাচিৎ। ১৯৫২ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গ প্রতিযোগিতায় ১০০ মিঃ সাঁতারে ব্রজেন দখল করে নিয়েছিল প্রথম স্থান। কলকাতায় এই ছয় বছরের সন্তরণ

জীবনে সাঁতারু হিসাবে ব্রজেন দাস যখন সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল তখনই কোন কারণে সে ঢাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়। হয়ত পারিবারিক প্রয়োজনই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর বাঙালির গর্ব ব্রজেন দাস সাঁতারের দুনিয়ায় যত কীর্তি স্থাপন করেছে তার সমস্ত গৌরব প্রাপ্য হয়েছে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের, যা আজ বাঙলাদেশ। তবে সেদিনের পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকেরাই প্রাপ্য স্থান থেকে বঞ্চিত করেছিল ব্রজেনকে। যদিও সারা পাকিস্তানে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ সাঁতারু। ১৯৫৩ থেকে ৫৬ পরপর চার বছর ব্রজেন দাস পূর্ব পাকিস্তান সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১০০, ২০০, ৪০০ এবং ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের সাঁতারে প্রথম হয়েছে। ১৯৫৫ সালে প্রথম হয়েছিল সমগ্র পাকিস্তানের প্রতিযোগিতায়। ব্রজেন বলল ঃ আমি নিশ্চিত ছিলাম ১৯৫৬ সালের অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ব অলিম্পিকে পাকিস্তানের প্রধান সাঁতারু হিসাবে দল থাকবেই। তবে দুর্ভাগ্য আমাকে না নিয়ে ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকেই পুরো সুইমিং টিম নিয়ে ওরা অলিম্পিকে যোগ দিতে চলে গিয়েছিল।

অযুত সম্ভাবনা নিয়ে যে দামাল তরুণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল এরকম বঞ্চনা তার সমস্ত কেরিয়ারের পক্ষে ক্ষতিকর তো বটেই তার মনোবলও এতে ভেঙে যাওয়ারই কথা। ব্রজেন বলল ঃ 'এরপর অলিম্পিক হবে আবার চার বৎসর পর। বয়স অনুযায়ী তখন ভাল ফল নাও দেখাতে পারি। তাই টিমে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মনটা বেশ খারাপ হইয়া গিয়েছিল। মনে মনে ঠিক করছিলাম সাঁতার আর কাটুম না।'

তারপর ?

ব্রজেন বলল ঃ তারপর ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কলকাতায় 'স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রে মিহির সেনের চার চারবার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে ব্যর্থতার ইতিহাস ফলাও করে ছাপা হয়। সেই ব্যর্থতার ইতিহাসই চ্যানেলের মোকাবিলায় আমাকে অনুপ্রাণিত করছিল । বাঙালী মিহির সেন চারবার চেষ্টা করেও যে লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি ব্রজেন সেই অসমাপ্ত কাজই যেন এক ব্রত উদ্‌যাপনের মত কাঁধে তুলে নিয়েছিল। তাছাড়া ওঁর এও মনে হয়েছিল চ্যানেলের সাঁতারে কোন নোংরা রাজনীতি নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই। সাঁতারু হিসাবে নিজের যোগ্যতা দেখাবার এও এক প্রশস্ত ক্ষেত্র।

ব্রজেন দাস ঠিক করে ফেলেছিল চ্যানেল সাঁতারের প্রতিযোগিতায় নেমেই তাঁর যোগ্যতার কঠিন পরীক্ষা দেবে।

কলকাতায় মিহির সেনের সঙ্গে দেখা করে চ্যানেলের সমস্ত খুঁটিনাটি জেনে নেবার পর শুরু করে দিয়েছিল লক্ষ্য অর্জনের একাগ্র সাধনা। কখনও সুইমিং পুলে, কখনও পুকুরে, কখনও নদীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমান্বয় সাঁতারের শ্রমসাধ্য অনুশীলন।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে দুরপাল্লার সাঁতারে সহ্য শক্তির পরীক্ষা দিতেই একটানা ৪৮ ঘণ্টা সাঁতার কেটেছিল ঢাকার সুইমিং পুলে। তবে কেটেই ওর মনে হয়েছিল, সুইমিং পুলের নিস্তরঙ্গ জলে সাঁতার কাটা আর চ্যানেলের খরস্রোত আর ঢেউ ভেঙে সাঁতার কাটা এক কথা নয়। ব্রজেন তাই ঠিক করেছিল পূর্ব বাঙলার দূরন্ত নদীগুলোর অশান্ত জলে দীর্ঘ সময় ধরে সাঁতার কেটে নিজেকে তৈরী করবে।

১৯৫৮-র মার্চ মাসে সে নেমে পড়েছিল নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যায়। লক্ষ্য ছিল শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, কিছুটা পদ্মা আর দূরন্ত মেঘনার উত্তাল জল ভেঙে ৪৫ মাইল দূরে চাঁদপুরে গিয়ে পৌঁছানো। ভাবুন, একটানা ৪৫ মাইলের সাঁতার।

নদীর তীর জুড়ে শত শত লোকের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের মধ্যে এক দামাল ছেলে সাঁতরে চলেছে পূর্ব বাঙলার চারটি দূরন্ত নদী। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সবার মুখে এককথা ঃ ৪৫ মাইল সাঁতরাইব ? মাইনষের সাইধ্যে কি সম্ভব ?

হ্যাঁ, প্রায় সম্ভব করে ফেলেছিল ব্রজেন দাস তবে বাধ সেধেছিল দূরন্ত কালবৈশাখী। সেই ঝড় উঠেছিল বলেই অন্তিম লক্ষ্যের মাত্র আধ মাইল দূরে ওকে উঠে পড়তে হয়েছিল। তবে প্রায় ৪৪১/২ মাইলের সেই দুঃসাহসিক এবং শ্রমসাধ্য সাঁতার সম্ভব করে সে খুঁজে পেয়েছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস। ওর মনে হয়েছিল চ্যানেলের ২৫/৩০ মাইল সাঁতার ওঁর পক্ষে মোটেই দুসাধ্য নয়।

ব্রজেন দাসের স্বপ্ন সফল করতে ততদিনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এম আর আতায়ূর রহমানকে প্রেসিডেণ্ট আর পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের সচিব এস.এ.মহাসীনকে সেক্রেটারী করে ঢাকায় গড়ে তোলা হয়েছলি 'চ্যানেল ক্রসিং কমিটি'। বাঙলা দেশের মানুষেরা সেদিন ব্রজেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সবাই একবাক্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ব্রজেনকে তাঁরা চ্যানেল সাঁতারের প্রতিযোগিতায় পাঠাবেন।

ব্রজেন বলল ঃ মহসীন ভাই হলেন ম্যানেজার। বাবা মা'র আশীর্বাদ নিয়ে, ভগবানের নাম স্মরণ করে ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা দিলাম ১৯৫৮-র ২৮ শে মে।......

তারপর একের পর এক ইতিহাস, সৃষ্টি করেছিল বুড়িগঙ্গার সেই দামাল ছেলে। আপনারা ওঁর সে-সব কীর্তির কথা কিছু কিছু হয়ত অনকেই জানেন। তবে সবটা হয়ত জানা নেই অনেকেরই। ইংলিশ চ্যানেলের প্রতিযোগিতায় এর তুহীনজলে ব্রজেনকে নামতে হয়েছিল রাত পৌনে দুটোয়। তারিখটা ছিল ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগষ্ট। কিছুক্ষণ পরেই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল ব্রজেন দাসকে খূঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চ্যানেলের কোথাও হারিয়ে গেছে ব্রজেন দাস।

ঠিক কি হয়েছিল ব্রজেনের মুখ থেকেই শুনুন ঃ তখন চ্যানেল ক্রস করতেই হবে এই ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। প্রতিযোগিতায় ২৩টি দেশের ২৯জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬জন মেয়েও ছিলেন। সবাই বেশ খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক সাঁতারু। একমাত্র আমিই ছিলাম নাম-না-জানা অপরিচিত মানুষ। সারা এশিয়া থেকে প্রতিযোগী শুধু আমি। সাঁতার আরম্ভ হবার ঘণ্টা দেড়েক পর দেখি আমাকে যে ডিঙি নৌকাটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটা দেখা যাচ্ছে না। পাঁচ-সাত গজ দূরেই ছিল নৌকাটা। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি নেই। চারদিকে আমার ঘন কুয়াশা। ভীষণ স্রোত। আর জলের কল্লোল। প্রায় ৪৫ মিনিট আমি দিক ভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক খুঁজছি। আর ডাকছি প্রাণপণ চিৎকার করে। পথ না দেখালে আমি এই আদিগন্ত সমুদ্রে যাব কোন দিকে ? যাহোক, পরস্পরকে যখন আমরা খুঁজে পেলাম ততক্ষণে অত্যন্ত মূল্যবান ৪৫টা মিনিট কেটে গেছে। নির্দিষ্ট পথ থেকে আমি সরে এসেছি অনেকটা। ততক্ষণে বেশ কিছু প্রতিযোগী এগিয়ে গেছে। নৌকোর ওরা আবার নির্দিষ্ট পথ দেখাতেই মরণপণ করে আমার নিজের ভঙ্গীতে সাঁতার কেটে চললাম। আর ছেলেদের মধ্যে আমিই পোঁছে গেলাম প্রথম। মূল্যবান সেই ৪৫ মিনিট হারিয়ে না গেলে ফলাফলের সময় আরও ভাল হত নিঃসন্দেহে।

আসুন, সন্তরণ জীবনে ব্রজেন দাসের কীর্তিগুলো পরপর স্মরণ করে নেওয়া যাক —

– চ্যানেল সুইমিঙে এশিয়ার মধ্যে প্রথম ১৯৫৮ সালে।

– ১৯৫৯-এ তিনটি আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড।

– ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে সবচেয়ে দ্রুতগামী চ্যানেল সাঁতারু হিসাবে বিশ্বরেকর্ড ১৯৬১ সালে।

– ইতালির ক্যাপরি আয়ল্যাণ্ড থেকে নেপলস পর্যন্ত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১৯৫৮ ও ৫৯ সালে।

– ১৯৫৮ থেকে ৬১র মধ্যে ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার বিশ্বরেকর্ড।

– ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৭ ক্রীড়াক্ষেত্রে ন্যাশনাল রেকর্ড।

ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নদীতে সাঁতার দেওয়ার অভ্যাস করে চ্যানেলের শীতল জলের খরস্রোতে কোন অসুবিধা হয়েছিল কি ? পদ্মা মেঘনা আর চ্যানেলের সাঁতারের মধ্যে পার্থক্য কিরকম মনে হয়েছিল ?

ব্রজেন বলল ঃ শীতল দেশের সমুদ্রের জলের তুলনায় এদেশের নদীর জল অনেক বেশী গরম। এসব আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম। আর তাই আড়াই মাস আগে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম নিজেকে তৈরী করার জন্য, প্রবল ঠাণ্ডা জলের ধকল এবং অন্যান্য বাধা-বিঘ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। গভীর রাতে ভীষণ ঠাণ্ডা জলে নামা, ব্যাপারটাই ছিল অন্যরকম। তারপর ওয়েদার খারাপ হতেই বড় বড় ঢেউ উঠতে থাকে। তাছাড়া আছে জেলিফিসের উৎপাত, যা শরীরে লাগতেই ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। তারপরেও গভীর সমুদ্রের জল-জন্তুর ভয় তো থাকেই। এসব বাধা জয় করতে হলে খুব ভাল সাঁতারু হতে হবে, আর ভয়কে ভুলে যেতে হবে. ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

ইংলিশ চ্যানেলে ঠিক কত মাইল সাঁতার কাটতে হয় ?

ব্রজেন বলল ঃ ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে ঠিক সোজা গেলে সাঁতার কাটতে হয় ২১ মাইলের ওপর। তবে ভীষণ স্রোতের জন্য ভাল সাঁতারুদেরও কমপক্ষে ৩৫ মাইল সাঁতার কাটতে হয়।

১৯৫৯ সালে একই বছরে তিনটি দূর পাল্লার সাঁতারে অংশ নিয়ে যে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিলি, সেই তিনটি সাঁতার কি কি ?

ব্রজেন বলল ঃ একই বছরে তিনটি লঙ ডিসট্যান্স সাঁতারের প্রতিযোগিতায় আমার আগে সারা পৃথিবীতে আর কোন সাঁতারু কোনদিন নামে নাই। তাই ওটা ছিল আমার এক রেকর্ড। সেই তিনটা দূরপাল্লার সাঁতার হইল – ১) ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড-চ্যানেল সাঁতার, ২) ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে চ্যানেল সাঁতার ছিল ১৯ কিলোমিটার।

ক্যাপরি থেকে নেপলস আর ফ্রান্স থকে ইংল্যাণ্ড -এই দুই দূরপাল্লার সাঁতারের মধ্যে কোনটা জটিল ?

ব্রজেন বলল ঃ আমার মনে হয়েছে , আর খোঁজ নিয়েও জেনেছি ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স চ্যানেল সাঁতারই সবচেয়ে জটিল, বিভিন্ন কারণে। গভীর রাত্রে সাঁতার কাটতে হয়, জল ভীষণ ঠাণ্ডা, সমুদ্র অনেক বেশী অশান্ত, জেলিফিসের উৎপাত, অন্যান্য অসুবিধা বেশী। ক্যাপরি নেপলস-এর সমুদ্র (ভূমধ্যসাগর) একেবারে নিস্তেজ। শান্ত পুকুরে সাঁতার কাটার মত।

গিনেস বুকে বিশ্ব রেকর্ডের জন্যে কোন সালে নাম ছাপা হয় ?

ব্রজেন বলল ঃ ঠিক কোন সালে উঠেছিল আমার নাম ঠিক জানি না। তবে ১৯৭৬-এ এডিসন বের হয়েছে তাতে আমার নাম আছে।

অনেক ঘুরে, অনেক দেখে ব্রজেনের মনে হয়েছে দূরপাল্লার সাঁতারু সবচেয়ে ভাল তৈরী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মিশরে, দক্ষিণ আমেরিকা আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলোয়। ওঁর শিষ্য শিষ্যা কিছু ভাল তৈরী হয়েছে, তবে গহীন সমুদ্রে দূরপাল্লার সাঁতারে ওঁর দেশের তেমন কেউ ওস্তাদ হয়নি। বিশ্বে ক্রীড়াজগতের নানান বিভাগে কৃতিরা সম্মানের সঙ্গে আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হন। তবে দূরপাল্লার সাঁতারে সেরকম কিছু ঘটে না। ব্রজেন জীবনে সম্মান আর প্রশস্তি পেয়েছে অনেক, তবে অর্থকরী দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। এ নিয়ে অবশ্য ওর বিন্দুমাত্রও খেদ নেই। সাঁতার কেটে চ্যানেলের রাজা হতে চেয়েছিল, তা সম্ভব হয়েছে, এতেই সে চরিতার্থ।

দূরপাল্লার সাঁতারের দুনিয়ায় ব্রজেন দাস আজ এক উজ্জ্বল তারকা। বৃটেনের এক সুখ্যাত সন্তরণ সংস্থার আজীবন সদস্য ব্রজেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্লড লঙ ডিসট্যান্স সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, বৃটেনের এ্যাসোসিয়েটেড সুইমিং টিচার ট্রেনার। ১৯৮৭ তে ইংলাণ্ডের চ্যানেল সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন ওঁকে সমাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে 'কিং অব চ্যানেল' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

তিনদিন ছিলাম ব্রজেনের সাথে। তিনদিনই কথা হয়েছে ওঁর চমকপ্রদ সন্তরণ জীবন নিয়ে। আপনারা হয়ত জানেন বিশ্ববিখ্যাত এই বাঙালি সাঁতারুর কিছুদিন আগে বাইপাস সার্জারি হয়েছে। ষাট বছর অতিক্রম করার পরেই আরেকবার চ্যানেল ক্রস করে আমেরিকার ৬৭ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ সাঁতারুর রেকর্ড ভাঙবে এই সঙ্কল্প নিয়ে ব্রজেন যখন ঢাকায় তৈরী হচ্ছিল তখনই ওর হৃদয় বিগড়ে বসে। কলকাতায় ডাঃ সুধাংশু ভট্টাচার্য সাফল্যের সঙ্গে বাইপাস সার্জারি করে ওঁকে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলেন। সমস্ত খরচ বহন করেন বাঙলাদেশ সরকার। ব্রজেন এখন ভগবানের দয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ এবং প্রফুল্ল।

ওঁর শোবার ঘরের দক্ষিণ দিকের দুটো জানালার ঠিক ওপাশেই কল্লোলিনী বুড়িগঙ্গা। জননীর মত যে নদী গড়েছে ওঁর সন্তরণ জীবনকে, যার কোলে দামাল ব্রজেন শৈশব থেকে তৈরী হয়েছে। চলে আসার দিন তৈরী হয়ে ওঁর ঘরে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি, ব্রজেন ঘুম থেকে উঠে শান্ত হয়ে বসে বুড়িগঙ্গাকে প্রণাম করছে।

ফিরে আসার পর এখনও বার বার ব্রজেনের ধ্যানমগ্ন সেই মূর্তিটাই চোখে ভাসছে। কৃতজ্ঞ ব্রজেন তার শৈশবের লীলাভূমি, জননী বুড়িগঙ্গাকে ভোলেনি। আর মনে পড়ছে ওর উজ্জ্বল চোখের তারায় সেই ইচ্ছার ঝিলিকটা।

'ষাইটের পর আরেকবার চ্যানেল পার হইতে পারলে ভালই লাগত।'

আমরা জানি, চ্যানেলে নামতে পারলে ব্রজেন দাস মার্কিন বৃদ্ধের সেই রেকর্ডও ভাঙত নির্ঘাৎ।